সুপ্রতীক অরূপ ঘোষ

অধরা মাধুরী

অধরার লেখা গুলো খুব সাজানো গোছানো খাতায় বা ডায়েরীতে লেখা নয়। যখন যেমন কাগজ হাতের কাছে পেয়েছে তাতেই লিখেছে বলে মনে হয় কিন্তু মনপ্রাণ দিয়ে লিখেছে। সেই পান্ডুলিপি এখন সুবুদ্ধির হাতের তলায় সযত্নে রাখা।

অধরার চিঠি বেশ কয়েকবার পড়েও সুবুদ্ধি তাকে ঠিক বুঝতে পেরেছেন কিনা তাই নিয়ে তার নিজের সংশয় কাটছেনা। চুপ করে বসে বসে – অতঃপর কি করণীয় – এই ভাবতে ভাবতে সুবুদ্ধির চোখ গেল অধরার লেখা একটি কবিতার পাতায়। বেশ কয়েকবার পড়ে ভাবলেন এই কবিতায় অধরাকে বেশ ধরা যায়।

অধরার কবিতা

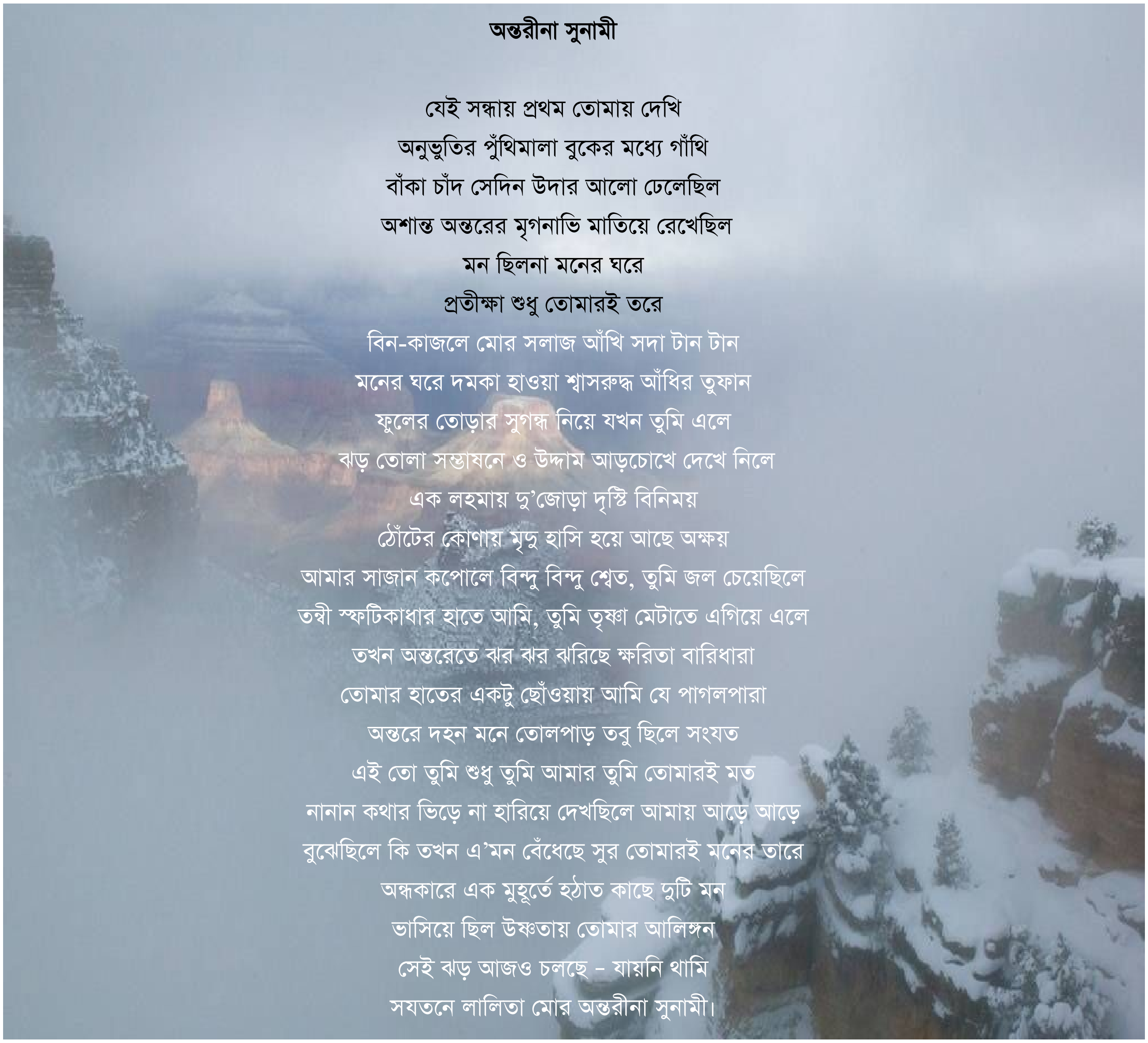

অন্তরীনা সুনামী

যেই সন্ধ্যায় প্রথম তোমায় দেখি
অনুভুতির পুঁথিমালা বুকের মধ্যে গাঁথি
বাঁকা চাঁদ সেদিন উদার আলো ঢেলেছিল
অশান্ত অন্তরের মৃগনাভি মাতিয়ে রেখেছিল
মন ছিলনা মনের ঘরে
প্রতীক্ষা শুধু তোমারই তরে
বিন-কাজলে মোর সলাজ আঁখি সদা টান টান
মনের ঘরে দমকা হাওয়া শ্বাসরুদ্ধ আঁধির তুফান
ফুলের তোড়ার সুগন্ধ নিয়ে যখন তুমি এলে
ঝড় তোলা সম্ভাষনে ও উদ্দাম আড়চোখে দেখে নিলে
এক লহমায় দু'জোড়া দৃষ্টি বিনিময়
ঠোঁটের কোণায় মৃদু হাসি হয়ে আছে অক্ষয়
আমার সাজান কপোলে বিন্দু বিন্দু শ্বেত, তুমি জল চেয়েছিলে
তন্বী স্ফটিকাধার হাতে আমি, তুমি তৃষ্ণা মেটাতে এগিয়ে এলে
তখন অন্তরেতে ঝর ঝর ঝরিছে ক্ষরিতা বারিধারা
তোমার হাতের একটু ছোঁওয়ায় আমি যে পাগলপারা
অন্তরে দহন মনে তোলপাড় তবু ছিলে সংযত
এই তো তুমি শুধু তুমি আমার তুমি তোমারই মত
নানান কথার ভিড়ে না হারিয়ে দেখছিলে আমায় আড়ে আড়ে
বুঝেছিলে কি তখন এ'মন বেঁধেছে সুর তোমারই মনের তারে
অন্ধকারে এক মুহূর্তে হঠাত কাছে দুটি মন
ভাসিয়ে ছিল উষ্ণতায় তোমার আলিঙ্গন
সেই ঝড় আজও চলছে – যায়নি থামি
সযতনে লালিতা মোর অন্তরীনা সুনামী।

অধরা কি নিজেকে অসম্পূর্ণা মনে করে? তাই এত আন্দোলিতা সে? কার ছবি অন্তরে নিয়ে এই লেখা! এই কবিতা যেন এক চলচ্চিত্র! ফ্রেম বাই ফ্রেম এই কবিতা যে লিখতে পারে সে এর আগে কখনও লেখেনি কেন? কেন সে একচল্লিশটি বসন্ত বর্ষা বা শীত পার করে দিয়েছে হেলায়? অধরা শুধু ভাল লেখিকা নন এক ভাবুক কবিও - কেন এই ছাই চাপা আগুনকে কেউ একটু খুঁচিয়ে দেয়নি কেউ? প্রশ্নটা মনে আসতেই সুবুদ্ধির দুটো কথা মনে হল।

প্রথমতঃ অধরার মত এরকম আরও কত প্রতিভা আছে যাঁদের সঠিক সময়ে একটু হাত ধরে এগিয়ে দেওয়া হয়না পৃথিবীর প্রায় সব দেশে। আমাদের দেশে ব্যাপারটা আরও প্রকট। তাঁদের সবাইকে যদিও সুবুদ্ধি চেনেনা কিন্তু সুবুদ্ধি সেই মানুষ নয়, যে কেবল দায় দায়ীত্বের জাবেদা খাতা নিয়েই জীবন যাপন করে – সে মনে করে রিচার্ড বাখ এর জনাথন লিভিংস্টোন সীগাল এর মত জীবন যাপন করা উচিত – এক সামান্য সামুদ্রিক চিল ভেবেছিল সব পাখীরই আকাশে ওড়া উচিত ওড়ার আনন্দ নেবার জন্য। পাখীদের শুধু গৃধ্নুর ক্ষুদা নিবৃত্তি করার জন্য ওড়া নয়। জনাথন তাই করেছিল। সুবুদ্ধি ভাবল শুরুটা অধরাকে দিয়েই হোক।

দ্বিতীয়তঃ এক প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার বোধ কি কাজ করছে মনের মধ্যে যে সে অধরার কথা তুলে ধরতে পারছে? তার জন্য কিছু করতে পারছে বলে? কার কাছে সে অধরাকে তুলে ধরেছে? না। কিচ্ছু পারেনি সে এখনও। অধরার জীবনে কোনও পরিবর্তন হবেনা এই লেখা ছেপে বেরোলেও। এই লেখা তো এক তত্ব। এই লেখা লিখলে অধরার জীবনে কোনও তারতম্য ঘটবেনা। তক্ষুনি সেই বোধ থেকে মুক্ত হয়ে সে আবারও ভাবল – অনেক সময় চলে গেছে, এবার কিছু করা যাক! এরই মধ্যে আরেক রবিবারের সকাল কেটে গেল সুবুদ্ধির। সুবুদ্ধি কি প্রেমে পড়ল এই পঞ্চাশের উঠোনে দাঁড়িয়ে? ভেবেই মনে মনে হাসল – না না একে শুধু প্রেমে পড়া বললে নিজের ও অধরার অনুভূতির প্রতি অন্যায় করা হবে। সাংসারিক জগতের দৈনন্দিন লেনদেনের সম্পর্ক যে এটা নয় তা সুবুদ্ধি জানে। তবে জীবনে প্রথম এই অনুভূতি হল বা হচ্ছে তার।

স্ত্রী তপশ্রীকেও সে পেয়েছিল সাত বছরের একমুখী প্রেমের বহতার পরে। তপশ্রী তখন জীবনের এক বাঁকে – এক মোহনায় দাঁড়িয়ে । সাত বছর ধরে সুবুদ্ধির প্রেম ছিল সতেজ ও সপ্রাণ কিন্তু একমুখী। আজও কি ওদের প্রেম একমুখী? না বোধহয়। আসলে শ্রী ঠিক প্রকাশ করতে পারেনা বা চায়না। সে নীরবে প্রেমের আনন্দ নিতে চায় – তা নিক না। তাকে তো সুবুদ্ধি ভালবাসে সেই ভাবেই যে ভাবে সেই ১৯৭৭ এর নাটকের রিহার্সাল রুমে প্রথম দেখে ভালবেসে ফেলেছিল। প্রথম দর্শনের প্রেমই সত্য – আর সব হাতছানি মিথ্যে হয়েই দাঁড়ায়। সুবুদ্ধির মনে হল।

শ্রী খুব ভাল কত্থক নাচত। সে আর আজ সম্ভব নয়। শরীর ভারী হয়েছে। স্লিপ ডিস্কের ব্যথা মাঝে মাঝেই চাড়া দেয়। ও কি করে উঠে দাঁড়াল ২০০১ এর ১১ই জানুয়ারীর পর সে এক মাত্র ঈশ্বর জানেন আর জানে সুবুদ্ধি আর ওদের কন্যা সুভশ্রী – সুভা। টানা চার মাস কাঠের পাটাতনে শুইয়ে রাখা হয়েছিল ওকে। ওর মধ্যে এক অদম্য বাঁচার স্পৃহা আছে যা সুবুদ্ধির সাথে খুব মেলে। শ্রীকে আবার গান গাওয়া শুরু করাতেও অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে এখনও হাল ছাড়েনি সুবুদ্ধি। শ্রী এখন মাঝে মাঝে গান গায় – মাঝে মাঝে সময় পেলে পুরোনো গুরুর কাছে যায়। তাঁর বয়স হয়েছে কিন্তু শ্রীকে সময় দেন তিনি। শ্রী শুধু শ্রীময়ী নয় ওর রূপ ওর চোখের গভীরে আর মনটা খুব মিষ্টি সুন্দর। সত্যিই খুব ভাল গায় শ্রী এত অযত্নে সত্বেও। ও যখন গান গায় তখন গলা সংগ দেয় ওর ইচ্ছাকে। অন্য সময় কাক চীলও ভয় পায় ওদের বাড়ীর ছাদে বসতে।

অধরার গলা ভীষন মিষ্টি ও সুরেলা তবে তুলনা করার কোনও অবকাশ নেই। শ্রী শ্রীই। ওর কোনও দ্বিতীয় নেই। শ্রী অদ্বিতীয়া। শ্রী কে সুবুদ্ধি প্রায়ই বলে তুমি সাতটা খুন করে এসে যদি একটা গান শোনাও তাহলে সবচেয়ে কড়া বিচারকও তোমাকে মাফ করে দেবেন। বলেই দুজনে হাসে – সে হাসি স্বীকৃতির। আজকাল দুজনে নিজেদের জন্য সময় পায়না একেবারে কিন্তু কোথায় যেন এক অটুট বন্ধন অনুভব করে সুবুদ্ধি তপশ্রীর সাথে আর তা বেশ সযতনে সাজিয়ে রেখেছে উত্তর প্রবীণ মনের মাঝে। শ্রী হল গিয়ে সুবুদ্ধির একাধারে

স্ত্রী, মা, কন্যা, বন্ধু ও প্রেয়সী যে বলে কম কিন্তু উপোভোগ করে অনেক বেশী আর সুবুদ্ধির এটা বেশ ভাল লাগে। শ্রী'র তুতো দাদা গণাদা ভাল বলে – "পাইছিলি এই একটা বান্দরেরে যার সব কিছু হইলি গিয়া তুই" আর শ্রী মুখ টিপে হাসে। আবার সাথে সাথে গণাদা সুবুদ্ধিকে বলে 'তুমি মনু কপালে হাত বুলাও – এই রকম একটা সহধর্ম্মিনী তুমি আগামী সাত জনমেও পাইবানা" – গণাদা হলেন গিয়ে বরিশালীয়া বাঙ্গাল ভাষার বিশ্বপ্রচারক – খুব মিষ্টি করে বলেনও। গণাদা আসলে ওদের দুজনকেই খুব ভাল বাসেন। সুবুদ্ধির প্রানের চেয়েও প্রিয় কন্যা সুভা মায়ের প্রায় সবটুকু সময় নিয়ে নেয় আর সারাদিন কাজের পর সংসারের নানান ঝামেলা সামলাবার পর শ্রীকে একটু শান্তিতে ঘুমাতে দেখলেই সুবুদ্ধির বেশ ভাল লাগে। সেই ভাল লাগাই কি ভালবাসা? হয়ত।

অধরা যেন সুবুদ্ধির মানস শিল্পী। অধরাকে না দেখে সে তাকে বন্ধুত্বের আধারে সাজিয়েছে। মনে মনে বলে – অধরা যেন তার প্রতিভার বিচ্ছুরণ ঘটাতে পারে আর তাতে যদি সুবুদ্ধির কোনও ভূমিকা থাকে তাহলে সে নিজেও খুব খুশী হবে। অধরা কি করে সুবুদ্ধির এতটা কাছে চলে এল তা নিয়ে ভাবার সময় নয় এটা – এখন অধরার মননের প্রকৃত প্রকাশ করাই তার একমাত্র কাজ। অধরাকে জলে নামানো গেছে এই ভালটুকুকে সে ঈশ্বরের দান বলে মনে করছে। এখন অধরার সৃষ্টিকে সে লালন করার গুরুদায়িত্বকে সুবুদ্ধি মাথায় তুলে নিয়েছে। অধরা কে? জানতে চান? তবে – **অধরার গল্প** পড়ুন।

বর্ণময় অন্তরালে

প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে শৈশবকে পেছনে ফেলে ক্রমশঃ এই আমিতে পরিণত হয়েছি। আমি কলকাতা শহরের এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে জন্মেছিলাম আমার মা বাবার একমাত্র সন্তান হিসেবে। আমার বাবা তমোনাশ দাশগুপ্ত আর আমার মা সহেলি দাশগুপ্ত। আমি তাঁদের এত আদরের ছিলাম যা কোনও রাজকন্যারও ঈর্ষার কারণ হতে পারে। কি পাইনি আমি? যখন যা চেয়েছি তাই পেয়েছি। প্রকাশ করিনি কিন্তু আমি তাই পেয়ে গেছি তাঁদের কাছ থেকে। আর সেই আমি – সেই আমি আজ সতের বছর আমার স্বামী ও আমার একমাত্র সন্তানের সাথে আত্মীয়স্বজনের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক জীবন যাপন করি যার মধ্যে কোনও কিছুর অভাব চর্ম্মচক্ষে ধরা পড়বেনা কিন্তু আমি জানি আমি কি অনিশ্চয়তা নিয়ে ঘর করি। তাই বোধ হয় আমি অধরা। আমাকে ধরা যায়না। একেক সময় মনে হয় এই আমি কি আসল আমি? আমার জীবনের প্রথম তেইশ বছর আর পরের সতের বছর একেবারে উত্তর দক্ষিণের মতই আলাদা। আমি যে কবে শেষ প্রাণ খুলে হেসেছি মনে নেই। শেষ কবে আমি আমার মত করে জীবনের স্বাদ নিয়েছি – মনে নেই। কবে যে শেষ গান গেয়ে নিজেকে 'যখনই চেয়েছি, খুঁজে পেয়েছি' মনে পড়েনা। কবে যে শেষ আমি হাসতে হাসতে মাটিতে বা খড়ের গাদায় বা গোলা ঘরের মাথায় শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রাণ খুলে গান গেয়েছি – তাও মনে নেই। গোলাঘরের খড়ের চাল বা সবুজ ঘাসে ভরা মাটী আমার প্রিয় বিলাসভুমি। আমার প্রাণের কথা ছিল এইরকম যা আমি সত্যি বলেই মনে করতাম – আজও করি কি? জানিনা। মনে পড়ে আমি ভাবতাম –

"জীবনের স্বাদ হল অলৌকিক সত্য চিরন্তন
এই মন ভেঙ্গে দেবে সময়ের সঙ্কীর্ণ বন্ধন
কত যে স্বপ্ন দেখি মনের চিদাকাশে
ডানা দাও হে ঈশ্বর উড়ে যাই দূরাকাশে
গন্ডীতে আবদ্ধ প্রাণী প্রাণ যেন ক্ষুদ্র বাসনা
এই ছবি দেখে দেখে ঝাপসা হয়েছে মনের আয়না"

থাক সে কথা।

থাক বলেই আমি চলে গেলাম আমার সেই ছোট্টবেলায় - কত হবে তখন আমার বয়েস - পাঁচ বছর বা তারও কম - আমার বাবার বন্ধু স্নেহাংশুকাকুদের লেক গার্ডেন্সের বাড়ির দোতলার বারান্দায়। বাবা স্নেহাংশু কাকুকে ছোটকু বলে ডাকতেন আর কাকু বাবাকে কর্মনাশা বলে। বাবা যদি আড্ডায় আসেন তবে সব কাজকর্ম পন্ড। কাকুদের সেই বারান্দায় অন্তাক্ষরী প্রতিযোগিতা, গানের রিহার্সাল, বাজি পোড়ানো, হোলির রঙ দিয়ে দেওয়াল এবং মুখাবয়ব রাঙ্গিয়ে দেওয়া আরও কত কি। কাকুর দুই মেয়েই আমাদের স্কুলে পড়ত - কিন্তু দুজনেই আমার স্কুলের দিদি তবে খুব বন্ধুর মত দিদি। কিন্তু কি ভাল যে ছিল সেও সব দিন গুলি। শুক্তিদি, সিতিদি শেহাংশুকাকুর দুই মেয়ে। সিতিদি বড়। শেহাংশু কাকুর দাদার মেয়ে সুলতা, সেও আমার দিদি - সেও পড়ত আমাদের স্কুলে। আর আমি সবার ছোট। বেশ আবদেরে মেনী ছিলাম আমি দিদিদের কাছে আবার দস্যিপনার জন্যে ওরা সবাই আমাকে একটু সমঝে চলত - না না আসলে ভালবেসে প্রশ্রয় দিত। কাকুর ছোট বোন তিতি পিসির মেয়ে - তুতু - তাকে আমি কি অত্যাচারই না করেছি। তুতু আমার থেকে পাঁচ-ছয় বছরের ছোট। আমি দিদি। তুতু আমাকে রিতিমত ভয় পেত। ওকে আমি খুব ভালবাসতাম আবার পেটাতামও মাঝে সাঝে। তুতুর ছোট বোন বুলি - সে তখনও জন্মায়নি। তাকে তাই খুব একটা কব্জা করতে পারিনি। তবে সে আমাকে বেশ বড় দিদি হিসেবে দেখত পরবর্তিকালে। বেশ ছিল সেই দিন গুলি। খেলাধুলো হত, দস্যিপনা হত আবার কত কি খাওয়া হত একসাথে। শীতের দিনে কাকু বা বাবা ফ্লুরিস থেকে কেক বা জলযোগ থেকে সিঙ্গাড়া আর পয়োধি এনে আমাদের ট্রিট দিতেন। লেক মার্কেটের জলযোগ কি এখনও আছে? জানিনা। তখনকার দিনের কোক দিয়ে আমাদের পার্টি হত। বাবা ও কাকু অবশ্য কোকের সাথে আরও কিছু মিশিয়ে নিতেন। আমরা সবাই মিলে যে কি আনন্দে সেই সব মুহূর্ত কাটাতাম!

পরের সঙ্খ্যায় পড়ুন...